ব্রহ্মপুত্র পাড়ের শহর ময়মনসিংহ থেকে পঞ্চরত্ন রওনা হলো সুরমা তীরের শহর সিলেটের উদ্দেশে। আধ্যাত্মিক নগর ও পুণ্যভূমি হিসেবে পরিচিত সিলেটকে প্রকৃতি কন্যাও বলা হয়। একদিকে পাহাড়, নদী, ঝরনার অপরূপ ছন্দময় অবস্থান আর অন্যদিকে প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাস, পাথর সিলেটকে করেছে সমৃদ্ধ।

পঞ্চরত্নের এবারের সিলেট ভ্রমণে একটা বাড়তি পাওয়া হচ্ছে ইরার চাচাত বোনের বিয়ে। তাই তারা খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় ছিল সবাই মিলে কবে সিলেটে গিয়ে পৌঁছাবে। ইরার চাচার পরিবার হবিগঞ্জে থাকে। ইরা আগেও সিলেটে কয়েকবার গেছে। সিলেট সম্পর্কে ইরার সংগ্রহ করা তথ্য থেকে বাকিরা সিলেট সম্পর্কে জানল।

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত সিলেট বিভাগ। সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ চারটি জেলা নিয়ে গঠিত এ বিভাগ। ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৩৬টি নদী রয়েছে সিলেট বিভাগে, যার মধ্যে অন্যতম প্রধান নদী সুরমা আর কুশিয়ারা। বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক রূপ সিলেটকে করেছে অনন্য। তাই ভ্রমণ পিপাসুদের আকৃষ্ট করে সিলেট।

সিলেটের গর্ব সিলেটের নিজস্ব লিপি নাগরি। নাগরিলিপিতে রচিত হয়েছে গল্প, উপন্যাস, কবিতা। নিচে একটি কবিতার দুটি লাইন—

"ওহে মন বুইদধি জদি থাকে তর মাজে
মিলিওনা তুমি কভু নাদান শমাজে..."

সিলেটি ভাষার লিখিত রূপের স্মৃতি ধরে রাখতে সিলেট শহরে সুরমা নদীর কাছে নির্মিত হয়েছে নাগরি চত্বর। ভ্রমণ পরিকল্পনা অনুসারে পঞ্চরত্ন সিলেট হয়ে হবিগঞ্জে পৌঁছাল। কারণ ইরার বোনের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণ করতে হবে। চাচার পরিবারের সাথে কথা বলে তারা ঠিক করে অনুষ্ঠানে বৃহত্তর সিলেটের ঐতিহ্যবাহী ধামাইল নাচ করবে। এর মধ্যে আগুন বলল বিয়ের কথা হলে আমার খাবারের কথা মনে পড়ে। সে কথা শুনে ইরার চাচা হাসলেন। আগুন চাচার কাছে স্থানীয় খাবার সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি খাবার সম্পর্কে বললেন।

সিলেটের খাবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শাতকড়া বা সাতকরা যাকে সিলেটি ভাষায় হাতকড়া বলে, একটি লেবু বা টক জাতীয় ফল। শাতকড়া একটি ঐতিহ্যবাহী রান্নার উপাদান। মাংস, সবজি ইত্যাদি নানা পদের খাবার রান্নায় স্বাদ আর ঘ্রাণ বাড়াতে ব্যবহার হয় শাতকড়া। এছাড়াও সিলেট অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয় খাবারের তালিকায় রয়েছে আখনি, হাঁস-বাঁশ, তুষা শিরনী, আখনি বিরিয়ানি, চুঙ্গাপিঠা। ঐতিহ্যে আগ্রহী ইরা জানতে চায় হাঁস-বাঁশ কি। চাচা বলেন, হাঁস আর বাঁশ তোমরা চেন। কচি বাঁশকে বলে কোড়ল। হাঁস রান্না করে কোড়ল কুচি করে তাতে দিয়ে যে নান্না তা ই হাঁস-বাঁশ। চুঙ্গাপিঠা (bamboo rice cake) তৈরি করা হয় বিশেষ ধরনের চাল ভিজিয়ে। নরম করে তা বাঁশের টুকরায় বা চোঙ্গায় ভরে ভাপে রান্না করতে হয়। দেখতে তাই নলাকৃতির হয়। এই পিঠা দুধের মালাই, খেজুরের গুড়, দুধের সর দিয়ে খেতে খুব মজা। সিলেটের ঐতিহ্যবাহী খাবারের গল্পের সাথে আয়োজিত খাবারের পর্ব শেষ হল। এবার সবাই মিলে গায়ে হলুদে পরিবেশনের জন্য গানের সাথে ধামাইল নাচ অনুশীলনের প্রস্তুতি নিতে লাগল।

ধামাইল নাচ

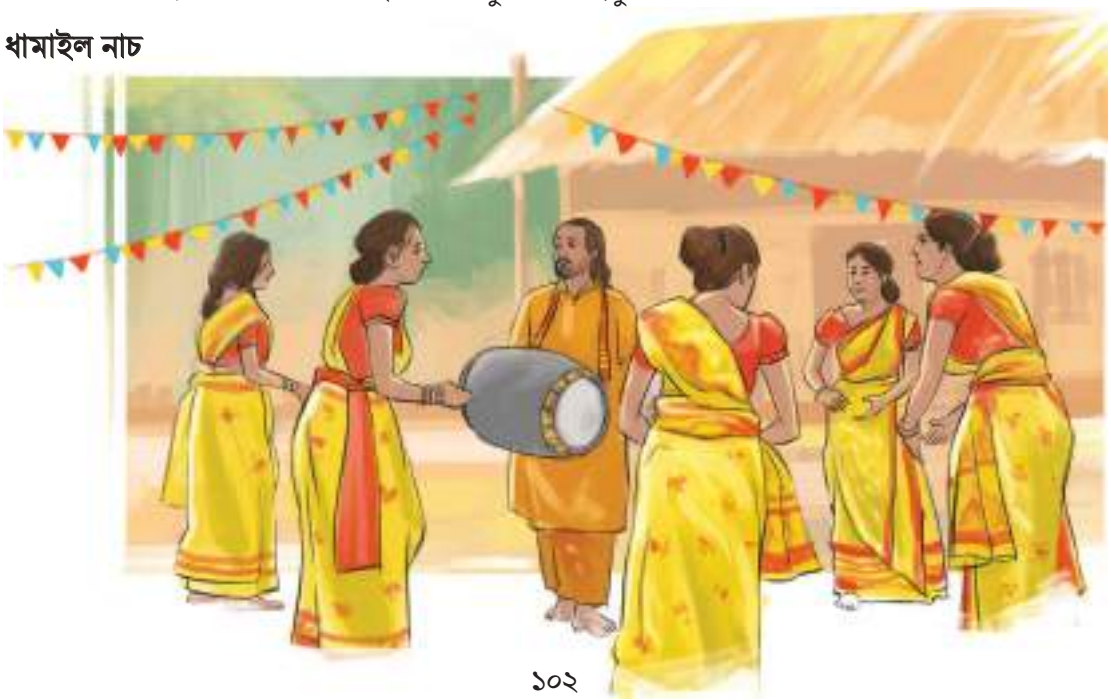

বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের বাংলার লোকনৃত্যের একটি প্রচলিত নাম ধামাইল। ধামাইল গান মূলত সামাজিক অনুষ্ঠানে হয়ে থাকে। বিশেষ করে বিয়ের আসরে পাকা দেখা থেকে বধূবরণ অনুষ্ঠানে গ্রামের নানা বয়সের মেয়েরা এই নৃত্যটি পরিবেশন করে। ধামাইল নাচের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো, করতালি সহযোগে বৃত্তাকারে মহিলাদের নৃত্যভঙ্গিমা। এই নৃত্যটি গীতপ্রধান বা গীতনির্ভর- এমনটি বলেছেন বাংলার লোকনৃত্যবিদ মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য। তিনি আরও বলেছেন এই পরিবেশনায় মূখ্য বিষয় পাঁচটি- করতালি, অঙ্গচালনা, পদচালনা, হস্তচালনা এবং শিরচালনা।

ধামাইল নাচের পরিবেশনারীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো —

এটি মূলত নারী পরিবেশিত সমবেত নৃত্য। পুরো পরিবেশনাটি বৃত্তাকারে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই নাচে তাল-লয়ের আধিক্য দেখা যায়, তবে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার খুব সীমিত আকারে হয়। মহিলারা নিজে গান গেয়ে এবং হাতে তালি দিয়ে তাল রক্ষা করে থাকে। বিয়ের আসরে পাড়া-প্রতিবেশীগণ, বর-বধূকে সুন্দর করে সাজিয়ে মাঝখানে রেখে চারপাশে বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করে। নারীদের দ্বারা পরিবেশিত বলে নৃত্যের ভঙ্গিমা শুধু কমনীয়, লাস্যময়ী নয়, সেইসাথে উদ্দীপ্ত এবং বলিষ্ঠও বটে।

করণকৌশল-

এই নাচটি সম্পূর্ণভাবে বৃত্তাকারে পরিবেশিত হতে হবে। পরিবেশনা রীতি অনুযায়ী বৃত্তটি সবসময় ডান দিকে আবর্তন করবে। পরিবেশনাটি শুরু হওয়ার সময় বিলম্বিত লয়ে হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে লয় বৃদ্ধি হয়ে পুনরায় তা ধীর লয়ে ফিরে আসে। পদক্ষেপ দেওয়ার সময় শরীর ঝুঁকে শুরু হবে এবং প্রতি ৩ মাত্রায় তা ক্রমান্বয়ে ঝোঁকা অবস্থা থেকে তালি দিতে দিতে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। সাধারণত ধামাইল নাচে এধরনের করণকৌশল হয়ে থাকে। এছাড়াও, বিভিন্ন ধরনের পরিবেশনারীতি দেখা যায়।

এই পাঠে আমরা যে ভাবে ধামাইল নাচ অনুশীলন করব

- ৮-১০ জন করে দল গঠন করব।
- প্রতি দল নিচের কোনো একটি গান বেছে নিবে ।
- দলের মধ্যে যারা গান গাইতে পারে তারা গান গাইবে। সেই সাথে বাকিরা নাচের ভঙ্গি করবে।
- ‘লীলাবালী লীলাবালী বর ও যুবতি সইগো’ ‘বিয়ার সাজনি সাজো কন্যা লো’।

বিয়ে বাড়িতে তারা নাচ গানের চর্চা করে এবং পরে তা গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে পরিবেশন করে। বিয়ের অনুষ্ঠানের পরদিন তারা গেল সুনামগঞ্জ জেলায় বিশিষ্ট মরমি কবি হাসন রাজা সম্পর্কে জানতে।

সুনামগঞ্জ জেলা শহরের উত্তর পশ্চিমে তেঘরিয়ায় অবস্থিত হাসন রাজার বাড়ি ও মিউজিয়াম। এখানে সংরক্ষিত আছে হাসন রাজার খড়ম, পোশাক, তলোয়ার, চেয়ার এবং স্মৃতি বিজড়িত নানা জিনিস ও তথ্য। এগুলোর মাঝেই ছড়িয়ে আছে তাঁর মরমি দর্শনের চিহ্ন।

মিউজিয়াম পরিদর্শনে গিয়ে তারা হাসন রাজার পরিবারের একজন সদস্যের দেখা পায়। তিনি পঞ্চরত্নের আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হন। তাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ও তথ্য দিয়ে তাদের ভ্রমণকে আনন্দময় ও অর্থপূর্ণ করে তোলেন।

হাসন রাজা

হাসন রাজার জন্ম ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন লক্ষণশ্রী পরগনার তেঘড়িয়া গ্রামে। যা বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। তিনি ছিলেন জমিদার পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী ছিলেন একজন প্রতাপশালী জমিদার। মা হুরমতজান বিবি।

হাসন রাজার আবির্ভাব বাংলার লোকসংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ। তিনি একাধারে গান রচনা করতেন, সুর করতেন ও সংগীত পরিবেশন করতেন। তিনি মানবপ্রেমের গান রচনা করেছেন। তাই তিনি মানবতাবাদী। আবার স্রষ্টা প্রেমে বিলীন হয়েছেন তাই তিনি মরমিবাদী। তাঁর রচিত 'হাসন উদাস' 'হাসন রাজার তিনপুরুষ' 'হাসন বাহার' ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে তাঁর গান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। 'আল ইসলাম' নামক পত্রিকায় ও অন্যান্য পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য গান প্রকাশিত হয়েছে।

অতি কম বয়সে পিতাসহ পরিবারের অনেক সদস্যকে হারিয়ে তিনি বুঝতে পারেন এ জগৎ সংসার আসলে অল্প দিনের। এই ভাবনা তাঁর সৃষ্টকর্মে উঠে আসে নানা ভাবে। তিনি লিখেন—

আমি যাইমুরে যাইমু আল্লার সংঙ্গে
হাসন রাজা আল্লাহ বিনে কিছু নাহি মাঙ্গে

জীবনযাপনে অতিসাধারণ হাসন রাজা জীবনকে দেখেছেন বর্ণিল করে। তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে সুনামগঞ্জের অপরূপ প্রকৃতির রূপ-রস আস্বাদন করে। জমিদার পুত্র হয়েও খাল-বিল-জঙ্গালে ছুটে বেড়িয়েছেন সাধারণ শিশুদের মতোই। পোশাক পরিচ্ছদে ছিলেন সাদামাটা। মাটির ঘরে থাকতেন। তিনি মনে করতেন এ জগৎ সংসারের মালিক আল্লাহ। একবার উত্তর ভারত থেকে আসা একদল পর্যটক তাঁর কাছে জানতে চান তাঁর ঘড়বাড়ির এই দৈন্যদশা কেন? উত্তরে তিনি বলেন এঘর বাড়ি কোনো কিছুর মালিক তিনি নন। আর তাঁর এ কথা ধ্বনিত হয় তাঁর রচনায়—

লোকে বলে বলেরে
ঘর-বাড়ি ভালা নাই আমার
কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যেরও মাঝার।।
ভালা কইরা ঘর বানাইয়া
কয়দিন থাকমু আর
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি
পাকনা চুল আমার।।
এ ভাবিয়া হাসন রাজা
ঘর-দুয়ার না বান্ধে
কোথায় নিয়া রাখব আল্লায়
তাই ভাবিয়া কান্দে।।
জানত যদি হাসন রাজা
বাঁচব কতদিন
বানাইত দালান-কোঠা
করিয়া রঙিন।।

হাসন রাজা মিউজিয়াম পরিদর্শনের পর পঞ্চরত্ন গেল শীতল পাটির গ্রাম কমলগঞ্জে। কমলগঞ্জ ছাড়াও এ জেলার রাজনগর, বালাগঞ্জ, বড়লেখা প্রভৃতি অঞ্চলে নকশি শীতল পাটি তৈরি হয়।

শীতল পাটি

শীতল পাটির ঐতিহ্য প্রায় হাজার বছরের। বিয়েসহ নানান অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শীতল পাটি উপহার দেওয়ার প্রচলন দীর্ঘদিনের। মেঝেতে, খাট বা চৌকিতে বিছানোর জন্য বেতের এক ধরনের আসন হলো শীতল পাটি। গরমের দিনে এই আসন শীতলতার প্রশান্তি এনে দেয়। গ্রামে এটি বিছানার চাদর বা মাদুর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সিলেটের শীতল পাটির সুনাম সারা বিশ্বে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম, ঝালকাঠি, পটুয়াখালি, সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইলেও শীতল পাটি তৈরি হয়। বিছানার চাদর থেকে সাজসজ্জার উপকরণ, ডাইনিং টেবিলের ম্যাট, চশমার খাপ, চটের থলে ইত্যাদিতে শীতল পাটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

যারা পাটি বুনে তাদেরকে পাটিয়ারা বা পাটিকর বলে। বংশপরম্পরায় পাটিয়ারা সুনিপুণভাবে শীতল পাটি তৈরি করে আসছে। মুর্ত্তা গাছের ছাল অর্থাৎ চামড়া দিয়ে শীতল পাটি তৈরি করা হয়। এই গাছকে গোড়া থেকে কেটে পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। এরপর দা দিয়ে চেঁছে অতি পাতলা করে ছাল ছড়িয়ে নেওয়া হয়। পাতলা ছাল বা বেতিকে মসৃণ ও সাদা করার জন্য ভাতের মাড়, গেওলা, কেওড়া, জারুল, আমড়া ইত্যাদির পাতা সিদ্ধ করে ডুবিয়ে রাখতে হয়। পরে এই বেত দিয়ে শীতল পাটি বুনা হয়। বুনন ও নকশার নিপুনতার তারতম্যে নানা নামের শীতল পাটি তৈরি হয়, যেমন- সিকি, আধুলি, টাকা, নয়নতারা, লাল গালিচা অন্যতম। এছাড়া পৌরাণিক কাহিনিচিত্র, বাঘ, হরিণ, কলাগাছ, ফুল-লতা-পাতা, জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদি চিত্রিত করেও নকশি শীতল পাটি তৈরি হয়। ইউনেস্কো ২০১৭ সালে সিলেট অঞ্চলের শীতল পাটিকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে।

এই পাঠে কাগজের ফিতা দিয়ে আমরা উপহার সামগ্রীর প্যাকেটের জন্য কাগজের পাটি বানাব

এই কাজটি করার জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে কিছু কাগজ, একটি ছোট কাঁচি আর সামান্য আঠা এবং পোস্টার রং।

- প্রথমে আমরা ১ ফুট লম্বা আর ইঞ্চি ছওড়া করে ২৪ টুকরো কাগজের ফিতা কেটে নেবো।
- ১২টি কাগজের ফিতা সামনে দিকে সমান লাইন করে বিছিয়ে নিব। যেটাকে আমরা বলব টানার দিক।
- ১২টি কাগজের ফিতা রাখব পাশাপাশি বুননের জন্য। এইটাকে আমরা বানার দিক বলব।
- টানার দিকের ১২টি কাগজের ফিতার ভেতর দিয়ে বানার দিকের ১২টি কাগজের ফিতা থেকে একটা একটা করে পার করাব। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে বানার দিকের কাগজের ফিতা প্রথম লাইনে টানার উপর দিয়ে পার করলে পরের লাইনে তা টানার নিচ দিয়ে পার করাতে হবে।
- এভাবে পাটির মতো করে আমরা সম্পূর্ণ বোনা শেষ করব। তবে মনে রাখতে হবে মূল পাটি বোনা হয় কোনাকুনি ভাবে। আমাদের কাগজ পাটিটি আমরা বুনব সোজাসুজি ভাবে।
- বুনার শেষে বানার নিচের ফিতাটি এবং উপরের ফিতাটি অল্প আঠা দিয়ে টানার ফিতাটির সাথে আটকে দেবো। এতে বোননটি খুলে যাবে না।

- এবার বুননের মাঝের অংশের ছক ধরে ইচ্ছামতো রং করে আমরা মনের মতো নকশা করতে পারি।
- এইভাবে কাগজ পাটি তৈরি করে খুব সহজে আমরা উপহার সামগ্রী প্যাকেট করে প্রিয়জনদের দিতে পারি।

কাগজের ফিতা দিয়ে পাটি তৈরির নকশা

কমলগঞ্জের শীতল পাটির গ্রাম দেখে তারা জৈন্তিয়া পাহাড়, জাফলং, বিছানাকান্দি, চা বাগান, রাতারগুল, শ্রী শ্রী দুর্গাবাড়ি মন্দির, মণিপুরি রাজবাড়ি প্রভৃতি জায়গা ভ্রমণ করে। তারা গেল হাকালুকি হাওড় ভ্রমণে।

হাকালুকি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হাওড়। এটি এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম মিঠাপানির জলাভূমি। হাকালুকি হাওড় মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা, কুলাউড়া, সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ এবং বিয়ানীবাজার জুড়ে বিস্তৃত। শীতকালে পরিযায়ী পাখিদের বিচরণ হয় এই এলাকায়। হাকালুকি হাওড়ের খসড়া স্কেচ তারা তাদের বন্ধুখাতায় করে নিল। এরপর তারা গেল মুক্তিযুদ্ধ ভাস্কর্য চেতনা'৭১ দেখতে।

চেতনা'৭১

চেতনা'৭১ মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে নির্মিত সিলেটের প্রথম মুক্তিযুদ্ধ ভাস্কর্য। এটি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মিত হয় ২০০৯ সালে। চেতনা'৭১ এর একটি বিশেষত্ব হলো শিক্ষার্থীরা প্রথম একটি অস্থায়ী ভাস্কর্য নির্মাণ করে। **পরবর্তীতে** স্থায়ী ভাস্কর্য নির্মিত হয়। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের সাথে মিল রেখে লাল ও কালো ইটে তৈরি করা হয়। ভাস্কর্যের নকশা প্রণয়ন এবং নির্মাণ সম্পন্ন করেন শিল্পী মোবারক হোসেন নৃপাল।

৩টি ধাপের উপর মূল বেদি এবং তার উপর ফিগারটি। নিচ থেকে প্রথম ধাপের ব্যাস ১৫ ফুট, দ্বিতীয় ধাপের ব্যাস সাড়ে ১৩ ফুট, উপরের ধাপের ব্যাস ১২ ফুট। ধাপ ৩টি দশ ইঞ্চি করে উঁচু। এই ধাপ ৩টির উপরে রয়েছে ৪ ফুট উঁচু বেদি। তার উপর ৮ ফুট উঁচু ফিগার।

ভাস্কর্যটিতে রয়েছে দুজন শিক্ষার্থী । জাতীয় পতাকা উঁচুতে তুলে ধরার ভঙ্গিমায় একজন ছাত্র এবং সংবিধানের প্রতীকী বই হাতে একজন ছাত্রী দাঁড়িয়ে। দেখে মনে হয় নির্ভীক প্রহরীর মতো বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষায় মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান আর দেশের প্রতি গভীর ভালবাসা নিয়ে পঞ্চরত্ন যাত্রা করল দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে।

এ অধ্যায়ে আমরা যা করব—

- বইয়ে দেয়া নির্দেশনা এবং ছবি দেখে কাগজের ফিতা দিয়ে উপহার সামগ্রীর প্যাকেটের জন্য কাগজের পাটি বানাব এবং তাতে রঙ দিয়ে নকশা করব।
- বইয়ে দেয়া নির্দেশনা অনুসরন করে উল্লেখিত গানের সাথে করনকৌশল অনুসরণ করে ধামাইল নৃত্য অনুশীলণ করব।
- বইয়ে দেওয়া মরমি কবি হাসন রাজার 'লোকে বলে বলেরে' গানটি নিজেদের মতো করে গাওয়ার চেষ্টা করব।
- মরমি কবি হাসন রাজার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আরও জানব এবং হাসন রাজার গানগুলো চর্চা করব।